মহুয়া নাট্য ও চর্চায় নারীর প্রতিরূপায়ণ

সারসংক্ষেপ:

এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে দ্বিজ কানাই রচিত মহুয়া পালাটির পাণ্ডুলিপি ভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি ময়মনসিংহ শহরকেন্দ্রিক তিনটি নাট্যদল কর্তৃক প্রযোজিত নাটকে নারীর প্রতিরূপায়ণ সম্বন্ধে। পালাটির পাণ্ডুলিপিতে যেমন নারী সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি নারী সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যাখ্যায় নারীর বর্তমান পরিস্থিতি এবং সমাজের চোখে নারীর অবস্থান উপস্থাপনের প্রয়াস মিলেছে। পালাটিতে মহূয়া'র চরিত্র এবং কর্ম ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে যে একজন নারী অর্থনৈতিকভাবে উপার্যন সক্ষমতা থাকা শর্তেও কীভাবে সমাজে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতায় নিস্কৃয় ভূমিকা পালন করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বাস্তবতায় নিজের জীবনের একান্ত সিদ্ধান্তগুলোও অন্যের ইচ্ছায় তাড়িত করতে বাধ্য হয় এবং এর ব্যত্যয় করতে গিয়ে আত্মহুতি দিতে হয়েছে তাকে। একইভাবে পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনায় আসার সময় নাট্যদলসমূহে পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নারীকে কীভাবে উপস্থাপন করেছে তা উপস্থাপিত হয়েছে প্রবন্ধটিতে। বাংলাদেশের দেশজ নাট্যচর্চা পালাগানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় পাশাপাশি বর্তমানের চর্চায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষ সমতার কথা বললেও সর্বক্ষেত্রে সমসাময়িক চর্চায় নারীর আত্মমর্যদা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই প্রবন্ধটি মূলত নাটকের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণে গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে।

Summary:

This article discusses both the manuscript of *Mahua Pala* written by Dwij Kanai and how women are shown in three theatre productions performed by theatre groups based in Mymensingh town. The manuscript explains traditional ideas about women, while the modern stage versions try to show how women are seen in today's society. In the *Pala*, Mahua's character and actions show that even if a woman can earn money, she still does not have the power to make important decisions in society. In a male-dominated system, she is forced to follow the wishes of others, even when it comes to personal choices in her life. When she tries to go against this system, she has to sacrifice herself. The article also shows how the theatre groups have presented women on stage during the transition from script to performance. This helps us understand the features of traditional *Pala Gaan* in Bangladesh and also shows that some changes are happening in today's theatre. Although the Constitution of Bangladesh talks about equality between men and women, in

real life women still struggle to establish their self-worth in many areas. This article helps us realize how theatre can be a way to understand and reflect on society.

চাবিশব্দ: মহুয়া, বাংলাদেশের নাট্যে নারীবাদ, ময়মনসিংহের নাট্যচর্চা, নাট্যপ্রযোজনা বিশ্লেষণ, প্রতিরূপায়ণ।

Keywords: Mohuya, Faminism in Bangladeshi Theatre, Theatre in Mymensingh, Production Anlysis, Representation.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৬৫০ সালের নারী সম্বন্ধীয় ধারণা লাভের পাশাপাশি তিনটি নাট্যদলের প্রযোজনা বিশ্লেষণ এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্তমান নারীভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতি অনুসন্ধান করা।

গবেষনা পদ্ধতি: এই গবেষণাকর্মটি মিশ্র পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে। পাঠ/ আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীতত্ত্বের আলোকে পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষিত হয়েছে পাশাপাশি পাণ্ডুলিপির নারীভাবনার সাথে সমসাময়িক নারীভাবনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভূমিকা:

বিনোদন নাটকের প্রধান লক্ষ্য নয়। পরিবেশনা তত্ত্বের ভিত্তিতে বলতে গেলে, পরিবেশনার উদ্দেশ্য বিস্তর। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড শেখনার বলেন, 'পরিবেশনা করা হয় বিনোদনের জন্য, সৌন্দর্য তৈরি করতে, পরিচয় চিহ্নিত করা বা পরিবর্তন করার জন্য, সম্প্রদায় তৈরি বা প্রতিপালনের জন্য, নিরাময় করতে, শিক্ষাদান বা রাজি করার জন্য, এবং পবিত্র ও শয়তানদের মোকাবেলা করতে পরিবেশনা ভূমিকা পালন করে।'[১] সুতরাং সমাজে নাটকের গুরুত্ব রয়েছে। সমাজে অন্যান্য অনুষঙ্গের মতো নাটক তার নিজ ক্ষেত্র হতে সমাজকে ব্যাখ্যা এবং চলার পথ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করে। নাটক সমাজ- সংস্কৃতি এবং মানবিক উন্নয়নের স্বরূপ প্রকাশে ভূমিকা রাখে।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীকেন্দ্রিক যেসব চিন্তা সমাজে এবং সাহিত্যে বিদ্যমান তা যেমন সামগ্রিক জাতির উপর প্রভাব ফেলে, একই সাথে সমাজের দর্শন ও সাহিত্য নাটকে প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় থাকে। বিদ্যমান জ্ঞান যেমন নারী সম্পর্কে প্রতিনিয়ত চিন্তার খোরাক যোগায় তেমনি নারী নিজেও তার কর্মের মাধ্যমে নিজের অবস্থানের ছাপ রেখে যায়। 'সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষ পাশাপাশি সক্রিয় হতে হয়, কারণ উন্নয়ন

একটি ধারাবাহিক এবং যৌথ প্রক্রিয়া। উন্নয়নের সঙ্গে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত প্রায় সমান।[২] দেশের আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ সকল চিন্তার একটা সুস্পষ্ট প্রভাব আছে যা সমাজে নারীর অবস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে নাটক প্রযোজনার কিংবা পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের ফলে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত চার খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খণ্ডে যে দশটি পালাগান স্থান পেয়েছে সেগুলোই ময়মনসিংহ গীতিকা বলে স্বীকৃত। দ্বিজ কানাই প্রণীত 'মহুয়া পালা', বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী প্রণীত পালা 'মলুয়া', দ্বিজ ঈশান প্রণীত 'কমলা পালা', বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতীর প্রণীত 'দস্যু কেনারাম পালা', নয়াচাদ ঘোষ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী', কঙ্ক ও লীলা পালার পালাকার হিসেবে ধারণা করা হয় 'রঘুসুত'। দামোদর, শ্রীনাথ, নয়ানচাদ ঘোষ এই চারজনকে, মনসুর বয়াতি প্রণীত 'দেওয়ান মদিনা পালা', 'জয়চন্দ্র পালা', 'রূপবতী', 'কাজলরেখা' ও 'দেওয়ান ভাবনা' পালার পালাকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। বলাবাহুল্য ময়মনসিংহ গীতিকা মূলত বর্ণনাত্বক রীতিতে পরিবেশিত হয় যেখানে প্রচুর নাটকীয় ঘটনার বিবরণ ও চরিত্রের উক্তি- প্রত্যুক্তি থাকে। এই দশটি পালার প্রায় সবগুলোতেই নারী চরিত্রের অবস্থান প্রকাশ ও এ অঞ্চলের মানুষদের নারী সম্বন্ধীয় চিন্তা ও দর্শনের ইঙ্গিত বিদ্যমান।

বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় দ্বিজ কানাইয়ের 'মহুয়া' যখন দৃশ্যকাব্য আকারে মঞ্চ উপস্থাপন হচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে নারীকেন্দ্রিক চিন্তা তৎকালীন প্রেক্ষিতের (১৬৫০ সালে পালাটি লিখিত হয় বলে গৃহীত) তুলনায় বর্তমানের নারীর উন্নয়ন বা দার্শনিক ভাবনায় নারীর অবস্থান নির্ণয় করে প্রণীত এ প্রবন্ধের মাধ্যমে সমকালীন নারী উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা যেতে পারে ।

যেকোনো গবেষণা সম্পাদনের জন্য তত্ত্বীয় হাতিয়ার অত্যন্ত জরুরী। তত্ত্বীয় কাঠামোর মাধ্যমেই একটা গবেষণাকে সর্বজনগ্রাহী এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এ প্রবন্ধের নিমিত্তে গবেষণা কর্মটির তত্ত্বীয় হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্বের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। নেয়া হয়েছে ক্ষমতা কাঠামো সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা, এছাড়া ডব্লিউ, জে, টি, এইচ মিচেল প্রবর্তিত প্রতিরূপায়ণ তত্ত্বের আলোকে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাস্তবকে উপস্থাপনার বিকল্পরূপ হচ্ছে প্রতিরূপায়ণ। বাস্তবের যে কোনো কিছুর প্রতিরূপায়ণ করা যায় বাচিক ও সংকেতায়নের মাধ্যমে। প্রতিরূপায়ণ নিরপেক্ষ কিছু নয়, এটা ব্যাখ্যামূলক, 'রাজনৈতিক' নয়, সর্বজনীনও নয়। দেশ, কাল, পাত্রভেদে এর ধারণা পরিবর্তিত হয়। মতাদর্শ, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক

ব্যবধান, চিহ্নের দ্যোতনা এবং ব্যাখ্যার বাহাস (discourse) বিচিত্র হওয়াতে এর রূপায়ণ বিচিত্র এবং একই সাথে বাচনিক ও দৃশ্যগত।

মিচেল প্রতিরূপায়ণ সম্পর্কে বলেন,

> জীবনের প্রতিরূপায়ণ হচ্ছে সাহিত্য সম্পর্কে সবচেয়ে সর্বসম্মত ও সাধারণ সচেতন জ্ঞান। প্রতিরূপায়ণ সাহিত্য বোঝার জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। কারও কারও মতে এটা সাহিত্যের চূড়ান্ত রূপ দান করে। ...প্রতিরূপায়ণে দুটি পদ্ধতি Stand for (পক্ষে দাঁড়ানো) এবং act for (পক্ষে কথা বলা)। নাট্যে এই দু'টি বিষয় একসাথে আসে যেখানে অভিনেতা পক্ষে দাঁড়ায় (Stand for) বা ছদ্মবেশ ধারণ করে গল্পের চরিত্রের হয়ে (act for /পক্ষে কথা বলা)।[৩]

আমি কি অর্থে কোনো কিছু উপস্থাপন করছি আর কি অর্থ তৈরি হচ্ছে সেটাও প্রতিরূপায়ণ তত্ত্ব অনুযায়ী বিশেষভাবে বিবেচ্য। মহুয়া নাট্যের ক্ষেত্রে (Act for) পাণ্ডুলিপিভিত্তিক উপস্থাপনে কী অর্থ উপস্থাপন করেছে আর বিশ্লেষণে কী প্রতিরূপায়িত হয়েছে (Standing for) তা ব্যাখ্যা এবং সমসাময়িক ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রযোজিত 'মহুয়া' পালা/ নাট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

পাণ্ডুলিপিতে নারীতত্ত্ব অনুসন্ধান

সমকালীন ময়মনসিংহ গীতিকাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলেও গীতিকার কাহিনিগুলো বিনির্মাণ হয়েছে মূলত নারীর প্রেম- শক্তির জয়গান, সতীত্ব, নারীর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। পালানাট্যের গঠনশৈলী অনুযায়ী পালাসমূহের প্রারম্ভে বন্দনাগীত পরিলক্ষিত হয়। 'মহুয়া' পালাতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এই পালার নামকরণের মধ্যে দিয়েই অনুধাবন করা যায় নাট্য আখ্যানের মধ্যে নারী চরিত্র মহুয়ার রূপরেখাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু পালার বন্দনাগীতিতে গাজী জিন্দা পীর, চান্দ সওদাগর, হযরত আলী'র উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও কোনো নারী দেবীর উপস্থাপন লক্ষ করা যায় না। ভারতীয় ভাবদর্শনে চান্দ সওদাগরের এর চেয়ে মনসা দেবী এই পালার বন্দনা গীতিতে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। কেননা, ভারতীয় পুরাণ অনুসারে চান্দ সওদাগর শিব পুজারী সাধারণ একজন মানুষ। অপরদিকে, মনসা দেবী ছিলেন লৌকিক দেবী। ঐতিহ্যবাহি লোকনাট্যের বিভিন্ন পালার বন্দনায় সরস্বতী দেবী উল্লেখ থাকলেও নারীকেন্দ্রিক 'মহুয়া' পালায় কোন নারী দেবীর বন্দনা পরিলক্ষিত হয় না। বোধ করি উক্ত পালায় নারী দেবীর অনুল্লেখ থাকাটা পুরষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বহিঃপ্রকাশ করে।

পালার প্রধানতম চরিত্রের মধ্য অন্যতম 'হুমরা বাইদ্যা'। বেদে সম্প্রদায়ের প্রধান হুমরা বাইদ্যার বর্তমানে বেদে পেশার পাশাপাশি তামশা খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও একসময় তিনি ডাকাতি করতেন। হুমরা ষোল বছর আগে ডাকাতি করতে গিয়ে ছয় মাসের শিশু কন্যাকে চুরি করে নিয়ে আসে।

ছয় মাসের শিশু কন্যা বচ্ছরের হৈল।
পিঞ্জরে রাখিয়া পঙ্খি পালিতে লাগিল ॥
এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।
খেলা কছরত তারে যতনে শিখায় ॥ (কানাই, ১৬৫০, পৃ: ৪২)[৪]

'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং নারী হয়ে ওঠে।'[৫] (বোভোয়ার, ২০০৮) সিমোন দ্য বোভেয়ার এর উক্তি অনুযায়ী, মহুয়াকে গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে তাতে উল্লেখ আছে, মহুয়াকে হুমরা বেদে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যতন (যত্ন) করে নানা রকম কছরত (কসরত) শিখিয়েছেন। হুমরা নিজের হাতে মহুয়াকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দক্ষ করে গড়ে তুলেছেন। তাকে একা বাড়ির বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা, দলের অন্য সদস্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার, সাপ তথা ভয়ানক প্রাণির সাথে বন্ধুত্ব প্রভৃতি করতে শিখিয়েছে। অথচ মহুয়া যখন নিজের পছন্দের ছেলের সাথে প্রেম- প্রণয়ে আবন্ধ হয়েছে ঠিক কখন হুমরা তাতে অসম্মতি পোসন করছে। শারীরিক ভাবে মহুয়াকে খেলাধুলাসহ নানাবিধ কসরত শিখিয়ে বড় করলেও প্রতিবাদ করার অধিকার তার নাই। সে যেনো মানসিকভাবে দূর্বল অর্থ উপার্জনের এক যন্ত্র। মহুয়াও হেজিমনির স্বীকার হওয়ায় নিজের সিদ্ধান্ত নিতে তাকে বেগ পেতে হচ্ছে।

গান করিতে আইলাম আমরা নইদ্যার ঠাকুরের বাড়ী ॥
বাজী করলাম তামসা করলাম ইনাম বক্সিস চাই ।
মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই ॥[৬]

পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে পালাকার একজন নারীর রূপকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। মহুয়া নানান বাজী এবং তামাসার মধ্য দিয়ে বক্সিসের পাশাপাশি নদেরচাদের মন প্রাপ্তির আকাংখা উপস্থাপন কড়ছে। পরবর্তীতে মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে নদের চাদের মনে মহুয়ার জন্য প্রেম ভাব জাগ্রত হয়েছে এবং তাকে পাবার বাসনা সৃষ্টি হয়েছে। একজন নারীকে নদেরচাদ তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়, বিশ্লেষণ করছে নারীর রুপ- সৌন্দর্য্য দিয়ে। আর এই রূপ- সৌন্দর্য্যবোধও সমাজ দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এর প্রভাব দেখা যায় নদেরচাদের আচরণেও। মহুয়াকে না দেখেই তার প্রতি প্রণয় লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতীয়মান হয় কেবলমাত্র মহুয়া সম্বন্ধীয় বর্ণনা শুনে।

নাটকে চরিত্রায়ণ ও অভিনয়ের মধ্যে জেন্ডার অভিকরণশীলতা পরিলক্ষিত হয়। নাট্যের প্রথম থেকেই মহুয়ার প্রতি যৌন আকর্ষণীয় শরীর কাঠমোর বিবরণ দিতে দেখা গিয়েছে। তাতে তাকে ভোগ্য বস্তু করে তোলা

হয়েছে। নাট্য প্রযোজনাতেও মহুয়ার পোশাক, রূপসজ্জা এবং চলনে এই অভিকরণশীলতার বহিঃপ্রকাশ অক্ষুণ্ন রাখতে দেখা যায়। শুধু নাট্যে নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী- পুরুষের এই অভিকরণশীলতা আত্মপরিচয় প্রকাশক বলা যেতেই পারে। উদীচী ময়মনসিংহের মহুয়া চরিত্রের নাম ভূমিকার অভিনেত্রী রুনা বলেন, 'আমি মহুয়ার মত হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। তার মত হাঁটাচলা, কথা বলা এমনকি তার কোমরের যে ভাঁজটা থাকবে ঠিক সেই রকম চলতে চেষ্টা করেছি। তার ওঠাবসাটাও একদম ঐরকম করার চেষ্টা করতাম।'[৭] যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে বেদে কোন নারীর সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেননি। অর্থাৎ সমাজের চোখে একজন বেদে নারী কেমন হতে পারে সেই চিন্তাই মূখ্য, অনেকক্ষেত্রেই চরীত্রের নানান স্তরের মানসিকতা উঠে আসে না অভিনেতার চরিত্রায়নে।

মহুয়া একাধিকবার একা নদীর ঘাটে এসেছে। এবারের উদ্দেশ্য শুধু পানি আনতে যাওয়া নয় বরং নদের চাদের সাথে দেখা করা। মহুয়া সমাজের প্রচলিত অন্য অনেক মেয়ের মতো নয়। বেদে নারী হিসেবে সে তুলনামূলক স্বাধীন বলা যেতে পারে। এই বেদে নারী যেকিনা অর্থ উপার্জনের সক্ষমতা রাখে, তাকেও বেদে সমাজের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হতে হয়। নিয়ম মেনে চলা কোনো অপরাধা নয় কিন্তু যে নিয়ম কোনো এক শ্রিণীকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার জন্য তৈরি সেই নিয়ম অবশ্যই সমস্যাপূর্ণ।

আমি যে অবলা নারী আছে কুল মান
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান।
পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা রইলা তুমি
কেমুন কইর‍্যা পাগল মনে বান্ধ্যা রাখাম আমি।[৮]

মহুয়া অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলেও নিজেকে অবলা বলে আখ্যায়িত করছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতাবান পুরুষের আদেশ তাকে মেনে নিতে বাধ্য হতে হবে। লড়াই করার সামর্থ তার নেই। প্রয়োজনে আত্মহনন করবে সে। মহুয়া একদিকে যেমন নিজের সমাজের মান- সম্মানের কথা ভাবছে অপরদিকে নদের চাদের প্রতি তার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। এখানে মহুয়ার নিজের মনোবাসনার চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কর্তৃত্ব।

নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা মরি ॥

এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা ।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥[৯]

মহুয়া বিশ্বাস করে তার বাবা ও সহোদর ভাই নেই বলেই হয়তো সে শ্যাওলার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। মহুয়া জানে যে, তাকে হুমরা চুরি করে নিয়ে এসেছে, স্বাবলম্বী নারী হওয়া শর্তেও প্রতিবাদের ভাষা তার অজানা। নাট্য আখ্যানের এক পর্যায়ে মহুয়া আর নদের চাদের প্রেমের ঘটনা সবাই জেনে গেলে হুমরা তার ষোল বছরের পিতৃত্তের দাবিতে নদের চাদকে হত্যাকরার অনুনয় করে। মহুয়া নদের চাদকে ভালবাসা সত্ত্বেও হুমরার কথায় নদেরচাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিষলক্ষের ছুরি নিয়ে যায়।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল
বাপের হাতে ছুরি লইয়্যা ঠাকুরের কাছে গেল
. . .
একবার দুইবার তিনবার করি।
উঠাইল নামাইল কন্যা বিষলক্ষের ছুরি।[১০]

এখানে মহুয়ার চাওয়া- পাওয়ার প্রতিফলন ঘটেনি রবং উক্ত স্থানে মহুয়াকে ভীরু আর নিষ্ক্রিয় অবস্থান নিতে দেখা যায়। মনে মনে নদের চাদকে ভালবাসলেও মনোঃদৈহিক অবস্থা থেকে মহুয়া তার ইচ্ছাকে সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করতে পারে নি।

হুমরার ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলির ‘স্যটুর’এর ধারণা হতে গ্রামসি শাসন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। ‘স্যটুর’ এমন একটি কাল্পনিক প্রাণি যার উপরের অংশ মানুষের এবং নিচের অংশ পশুর, অর্থাৎ একই সাথে মানবীয় এবং একই সাথে জান্তব। শাসনর্কায দুইভাবে পরিচালনা হতে পারে, এক সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে (মানবীয়), দুই বল প্রয়োগ (জান্তব) করে। এখানে দেখা যায় হুমরা প্রথমে মানবীয় সংকটে ফেলে মহুয়ার উপর বল প্রয়োগ করেছে। পিতৃত্বের দাবীতে সে নদের চাদকে হত্যা করতে বলছে। তাতে কাজ না হওয়ায় পরবর্তীতে জান্তবরূপ প্রকাশ পায় হুমরার আচরণে।

মহুয়া যখন নদের চাদের মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন হুমরা বাইদ্যার কথা ভুলে যায়। একদিকে সমাজের নিয়ম অন্যদিকে ভালবাসা। এই দুই এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় সেই দ্বান্দ্বিকতার সাথে লড়াই করে মহুয়া নদের চাদকে হত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। মহুয়া তার সমাজব্যবস্থাকে পায়ে পিষে নদের চাদের সাথে বের হয়ে চলে যায়। মহুয়াকে দমনের চেষ্টা করেছে হুমরা যেখানে মহুয়া কখনো হুমরার বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করতে পারছে না কারণ সে শৃঙ্খলিত, আবদ্ধ। তবে, তার মনে যখন প্রেম এসেছে তখন

সে কিছুটা বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সে কোনো কিছু মানেনি। এখনও আমাদের মাঝে যখন কেউ প্রেমে পড়ে তখন মানুষ কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। আর নদের চাদের প্রেমও শারীরিক প্রেমের উর্ধ্বে উঠে আত্মায় বিলীন হয়ে গেছে। যার ফলে মহুয়া আর কোনো কিছুকেই বিবেচনা না করে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।[১১]

মহুয়া নদের চাদকে নিয়ে যেকোনো স্থানে চলে যেতে প্রস্তুত। এখানে মহুয়ার নির্ভরতার জায়গা নদের চাদ। একা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও নদের চাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সে সহমত। ফলস্বরূপ নদের চাদের কথাই গুরুত্ব রাখে।

তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ি
এই হাতে মার লো কন্যা আমার গলায় ছুরি।[১২]

নদের চাদ ব্রাহ্মণ সমাজের উচ্চবিত্ত। নদের চাদ ছেড়ে এসেছে তার বাড়ি, বংশমর্যাদা। মহুয়াকে না পেলে সে ফিরবে না। এখানে ভালোবাসার যেমন প্রকাশ পায় পাশাপাশি একজন পুরুষ হিসেবে নদের চাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং একাগ্রতা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, মহুয়ার সিদ্ধান্ত নদের চাদের সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত।

কাল না ডাঙ্গর আঁখি লম্বা মাথার চুল
বিধি আজ মিলাইল মধু ভরা ফুল।
এমন যৌবন কন্যা যায় অকারণ
আমারে ভজহ কন্যা রাখ মোর মন।
এমন সোনার পানসী তাতে মাঝি নাই
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাঁই।[১৩]

বণিক অপহরণ করে মহুয়াকে, কারণ মহুয়া যৌবনবতী এবং অপরূপ সুন্দর। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা হচ্ছে না এক্ষেত্রে। যৌবনের রূপসৌন্দর্যের ভিত্তিতে মহুয়াকে বিশ্লেষণ করছে। তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্তমান বাজারি ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। পণ্যে মেয়াদ বসানো থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণের পরে তার কোন মূল্য থাকে না। নারীর ক্ষেত্রেও তাই। যৌবন ছাড়া নারী জীবন অর্থহীন। বণিক এবং পরবর্তীতে সাধুর ক্ষেত্রেও মহুয়াকে ভোগ্যপণ্য হিসেবেই দেখার প্রবণতা প্রকাশ পায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর আত্মপরিচয় প্রকাশে শুধুমাত্র নারীর শরীর মুখ্য হয়ে উঠেছে।

এতেক শুনিয়া কন্যা কি কাম করিল
সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল

পাহাড়িয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল
চুন- খয়েরে কন্যা বিষ মিশাইল।[১৪]

'মহুয়া পালা' - এর অন্যতম বিশেষ দৃশ্য মাঝিমাল্লা কর্তৃক মহুয়ার চরিত্রহরণের চেষ্টা। অপরদিকে, মহুয়া কর্তৃক মাঝিদের মেরে ফেলা সিদ্ধান্ত। মহুয়ার রূপে মত্ত হয়ে মাঝি- মাল্লা অসহায় মহুয়ার চরিত্রহরণের সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক তখন মহুয়ার ভিন্ন চরিত্র দেখা যায়। সাধুর ক্ষেত্রেও মহুয়াকে মনোঃদৈহিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে এবং মহুয়ার কর্তৃক মাঝিমাল্লাদের প্রতিহত করার বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। যেখানে মহুয়া এমন বিপদের মুহূর্তে নিজের বুদ্ধিমত্ত্বার পরিচয় দেয়। ছলাকলা করার অভিজ্ঞতা বেদে জাতের এক বিশেষ গুণ হিসেবে ধরা হলেও প্রতিনিয়ত আমরা নিজেদের প্রয়োজনে 'অবরাজনীতি'র প্রয়োগ ঘটাই। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা মহুয়ার রয়েছে এবং এমন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করাটা কম কথা নয়, তথাপি সবসময় সক্রিয় হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার নেই। পুরুষতন্ত্রের হেজিমনিই এর কারণ।

কও কও কও পক্ষী আরে কও তরুলতা
ঢেউয়ের কুলে পইরা বন্ধু এখন গেলো কোথা
শুন আরে বাঘ- ভালুক পরে আমায় খাও
বন্ধুর উদ্দেশ্য মোরে পরখাইয়া জানাও।[১৫]

প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে যে মহুয়া তার ভালবাসার মানুষকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছিল, সেই প্রকৃতি আর প্রাণিদের প্রশ্ন করছে মহুয়া। এখানে মহুয়া একা বনে সাহসী যোদ্ধার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিংস বাঘ- ভালুক এর সাথে কথোপকথন হচ্ছে। ফুকোর তত্ত্ব অনুযায়ী 'ক্ষমতা একক কোন ব্যক্তির কাছে পুঞ্জিভূত থাকেনা। ক্ষমতা নেটওয়ার্কের মতো কাজ করে।'[১৬] এখানে পুরষতন্ত্র নয়, হুমরা বাইদ্যা নয় মহুয়া নিজে ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে। নিজে লড়াই করে চলেছে যদিও বাঘ- ভালুক এবার তার সঙ্গী, এদের সহায়তা এবার মহুয়ার প্রয়োজন। বহু কষ্ট সাধনের পর মহুয়া এবং নদের চাদের মিলন হলেও পরবর্তীতে পালার বর্ণিত অংশে মহুয়া ও নদের চাদকে খুঁজতে হুমরা বাইদ্যার দলবল নিয়ে আক্রমনের ঘটনা ঘটে।

একদিকে সমাজের নিয়ম- কানুন অপরদিকে প্রেম। মহুয়াকে হুমরা বাইদ্যা প্রাণ নাসের হুমকি দেয়। পালায় দুইবার হুমরা বাইদ্যা নিজে বিষলক্ষের ছুরি মহুয়ার হাতে তুলে দেয়। পালার প্রথম অংশে আমরা জেনেছি যে হুমরা একজন ডাকাত সর্দার। সে নিজেও পারতো নদের চাদকে হত্যা করতে কিন্তু মহুয়ার হাতে বার বার ছুরি তুলে দেয়ার কারণ হিসেবে হুমরা বেইদ্যা তথা পুরুষতন্ত্রের অবাধ্যতার শাস্তি প্রদান করা। নিজের মতো মহুয়াকে খুনি হিসেবে অপরাধে অংশ করে নেয়া।

শুন শুন পালঙ্ক সই শুন বলি কথা
কিঞ্চিত বুঝিবে তুমি আমার মনের ব্যথা।[১৭]

পালং সই নিজেও একজন নারী। একজন নারী হিসেবে মহুয়ার জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সই নির্বাক দর্শক ন্যায় অবস্থান করতে দেখা যায়। পালং সই একজন নারী হিসেবে নারীর পাশে অবস্থান করে হুমরা বাইদ্যার আর মহুয়ার মধ্যে সমস্যা সমাধানের সক্রিয় ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করতে পারতো। মহুয়ার পাশে সইয়ের অবস্থান নেয়াটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তৎকালিন সমাজব্যবস্থার বেড়াজালে পালং সই নিজেও আবদ্ধ। তার মত প্রকাশের কোন অধিকার নেই।

পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা [১৮]

পালং সই সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। কোনো কথা বলার শক্তিও নেই। যদিও স্পিভাক মনে করেন নারীদের নিজস্বতা প্রকাশের সুযোগ নেই। তারা নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গ। তিনি আরও বলেন,

> নিম্নবর্গ কেবল অপজন নয়, নিম্নবর্গ কেবল শোষিত নয়। নিম্নবর্গ কেবল লুটের ভাগ পায়নি তেমন বঞ্চিত তা নয়, তারা কেউ কেবল দলিত নয়। সেই হচ্ছে নিম্নবর্গ যার সীমিত সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদে প্রবেশের অধিকার নেই। নিম্নবর্গ হচ্ছে সে, যে সব সময় গমনের পথে আছে।[১৯]

নারী নিম্নবর্গের প্রতিরূপ। পালং সই এবং মহুয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই। পালং সই চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছু বলার ক্ষমতা রাখে না। মাফা'র প্রযোজনায় পাণ্ডুলিপির ভিন্নতর ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে পালং সই চরিত্রের অভিনেত্রী নশিন আনবার তোয়া বলেন, 'সে মহুয়াকে উৎসাহ দিচ্ছে যে, না তুমি যেটা করছ সেটাই ঠিক, তুমি পালিয়ে যাও। তোমরা দুজন একসাথে থাকো। সহযোগিতা করছে।'[২০] এ প্রসঙ্গে জনাব লেলিন বলেন, 'পালং সহযোগিতা করত বিধায় তারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল।'[২১] 'মহুয়া' পাণ্ডুলিপি এবং প্রযোজনায় পালং সই- এর ভূমিকার পার্থক্য দেখা যায়।

> মহুয়া আত্মহনন করছে কারণ সে নিজের জীবনকে নয় ভালোবাসা কে জীবিত রাখতে চেয়েছে। নদের চাদ তার প্রেম। সেই প্রেমকে মেরে ফেললে তো প্রেমই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সে সংসারে প্রেমকে জীবিত রেখে নিজের বুকে ছুরিকাঘাত করেছে। সে নিজের জীবন দিয়ে হুমরার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজের রক্তচক্ষু বিজড়িত শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলছে, এখন তুমি কার উপর শাসন করবে! সে আত্মাহুতি না দিলে হয়তো এটা শেষ হবে না। সুতরাং মহুয়ার মৃত্যুটা ছিল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ।[২২]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেঁচে থাকতে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।' এখানেও মৃত্যুই কি নারীর প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়! এই একই বক্তব্য পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে কাহিনির শেষে হুমরার অনুতাপের মধ্যদিয়ে। হুমরার অনুতাপে দর্শকচিত্ত বিগলিত হয়। হুমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে বা ভাবতে পারে যে আপনজনকে শাস্তি নয় বরং স্বস্তিতেই ভালোবাসা দেয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নন্দিনী নাটকের রঞ্জন চরিত্রের যেমন মৃত্যু যক্ষপুরীতে গণজাগরণের উন্মেষ ঘটিয়েছিল, রাজার কঠিন মনকে কোমল করেছিল তেমনি মহুয়ার মৃত্যু সমাজের অহংকার চূর্ণ করে। শেষে হুমরার আদেশেই তাদের দুজনকে একসাথে কবরে শায়িত করা হয়। যেখানে মৃত্যু মানে মৃত্যু নয়, বিজয়েরই নামান্তর বলে উপস্থাপনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রায় প্রত্যেক পালার নামকরণে পাত্র- পাত্রীর চরিত্রকে গুরুত্ব দেয়। পালার নামকরণের দিকে মহুয়ার নামানুসারে হলেও পালার শেষাংশে বলা হচ্ছে

> এইখানে সাঙ্গ হইল নইদ্যার চাদের কথা।[২৩]

এখানে মহুয়ার ত্যাগ ও নামকরণের অকার্যকর অবস্থান তৈরি করেছে। পালার নামানুসারে কেনো নদের চাদের কথা শেষ হবার মাধ্যমে শেষ করা কতটা যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর শিল্পীরা দ্বিমত পোষণ করেন ফলে তারা গীতিকারের শেষ সংলাপ 'নদেরচাঁদের কথা'র এর সাথে বিরোধিতা করে নিজেদের উপস্থাপনার শেষে বলে যে, এইখানে 'সাঙ্গ হইল মহুয়ার কথা।' নৃত্যনাট্যের গ্রন্থকার অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক তাঁর লেখায় গীতিকারের থেকে ভিন্ন শব্দ ও পয়ার ব্যবহার করেছেন। তিনি সমাপ্তিতে মূল গীতিকারের চিন্তা থেকে এক ধাপ সামনে এগিয়ে পালার সমাপ্তি করেছেন। নদের চাদের ইহজাগতিক মৃত্যুর পর পরলোকে তাদের মিলিত করিয়েছেন। ইহজাগতিক, সামাজিক রীতিনীতি বিধি- নিষেধ তাদের মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে গ্রন্থকার এই মৌলবাদী সমাজ থেকে বের হয়ে এমন এক সমাজের কল্পনা করেছেন। এমন এক জগতের কল্পনা করেছেন যেখানে শ্রেণি বৈষম্য নেই, পিতৃতান্ত্রিকতা নেই, শাসকের শাসন নেই, পরাধীনতা নেই, যেখানে সবাই সবার ইচ্ছেকে সম্মান দেয়, নারী- পুরুষের অহং নয় কেবল মানুষরূপে মানুষকে সম্মান দেয়, তেমন সমাজে নিয়ে তিনি এই অতৃপ্ত যুগলের মৃত্যু পরবর্তী মিলন দেখান।

অপরদিকে, মাফা'র প্রযোজনা পৃথক ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়,

> হুমরা যখন মহুয়ার হাতে ছুরি তুলে দেয় তখন মহুয়া গিয়ে হুমরাকে অনুরোধ করে। পালং সই এমনকি নদের চাদও বলে যে, আমি লাগলে বেদে হয়ে তোমার দলের সাথেই থাকব তবু তুমি আমাদের রাখো (মেরো না) । নাটকে হুমরাকে তার ভুল বোঝানোর জন্য মহুয়ার মৃত্যুটা দরকার ছিল তবে মৃত্যুর আগে কখনো কখনো

> মহুয়ার প্রতি হুমরার স্নেহ জেগেছে কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার দ্বিধান্বিত হয়ে গেছে যে আমার দল টিকাইতে অইবো।[২৪]

সারোয়ার জাহানের মতানুযায়ী হুমরা বাইদ্যার দলের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মহুয়ার মৃত্যু প্রয়োজন ছিল। তার মতে,

> মহুয়ার থেকে নদের চাদের সেক্রিফাইস বেশি। এটা মনে করছি কারন, সম্যক দৃষ্টিতে যেহেতু সে একটা জমিদার, প্রাচুর্যতা তাকে আকর্ষণ করতে পারে নাই। কিন্তু অন্যদিকে জেনেটিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি যে মহুয়া বেদেদের কেউ না সুতরাং বেদে সমাজের যুক্তিসিদ্ধ চালচলন এইটা তাকে বেশি আকৃষ্ট করবে এটাই স্বাভাবিক। সেটা মুসলিম বা হিন্দু যাই হোক না কেন জেনেটিক্যাল একটা ব্যাপার আছে কিন্তু মহুয়ার প্রেমে জমিদারি ছাড়লো নদের চাদ। তবে অবশ্যই মহুয়ার সেক্রিফাইস আছে, যখন সুজন মহুয়াকে বলল নদের চাদকে হত্যা করতে তখন মহুয়া চাইলে নিজে আত্মহত্যা না করে নদের চাদকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু সে করে নি। এটা তার একটা সেক্রিফাইস হতে পারে। গতানুগতিক প্রথায় বিয়ে না হলেও তাদের ভিতর একটা আত্মিক বিয়ে হয়ে গেছে। সেই ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও প্রেমটা তো জেগে ওঠে। সুতরাং মহুয়া হয়তো আবেগের বশবর্তী হয়ে ওইটাকে বড় করে দেখে নিজের বুকেই ছুরি চালিয়ে দেয়।[২৫]

তাহলে কি আমরা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রেমের দায় অধিকাংশ নারীর উপর চাপিয়ে দেই?
এ প্রসঙ্গে সারোয়ার বলেন, '(ক্ষণকাল নীরবতা) নিঃসন্দেহে! এই প্রেম করা প্রেমকে যত্ন করা, শুশ্রূষা দেয়া এগুলোর দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে নারীরই বেশি। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তো আমরা তাই মনে করি।'[২৬]

সমাজে প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, নারী অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হলে তবেই পরিবারে তার মতামত প্রদান করতে পারে। সেখানে মহুয়া উর্পাজন করতে সক্ষম হলেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে যেভাবে সামাজিকীকরণ করা হয় মহুয়া সেই সামাজিকীকরণ মেনে নিয়ে প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকে। মহুয়া নাট্যসাহিত্য ব্যাখ্যা নারীর প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের নারী সম্বন্ধীয় ধারণা লাভের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারা যাবে বর্তমান সমাজের কতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সমকালীন প্রযোজনায় নারীর প্রতিরূপায়ণ

'মহুয়া' ময়মনসিংহের উদীচী শিল্পগোষ্ঠী মঞ্চায়ন শুরু করে আনুমানিক ১৯৮১ সাল থেকে। সর্বশেষ মঞ্চায়ন হয়েছিল ২০১৭ সালে। পালার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২ মিনিট। নির্দেশক যোগেশ দাস মহুয়া পালাকে সম্পূর্ণ গ্রামীণ আবেশে তৈরী করেছেন বলে অভিনেত্রীরা জানিয়েছেন। যদিও পালার ভিডিও প্রদর্শনী অনুযায়ী কোনো ভাবেই এটিকে বাস্তববাদী গ্রামীণ আবেশ বলে মেনে নেয়া যায় না। আনুমানিক ১৯৯৬ সালে মহুয়া

পালার যাত্রা শুরু হয়। মহুয়ার সর্বশেষ মঞ্চায়ন হয়েছে ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারি মাসে। **মহুয়া** পালা নৃত্যনাট্য আঙ্গিকে নির্দেশনা দেয়া হয়। অভিনেতা ছিলেন সুধীর দাস। শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন শাহাদাত হোসেন খান হিলু।

> আমাদের ময়মনসিংহ 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ২০০৯ থেকে যাত্রা শুরু কিন্তু আমরা এই টিমটাই নৃত্যজগৎ নামে একটা ব্যানারে আগে থেকেই কাজ করতাম **মহুয়া** পালা নিয়ে। নৃত্য যতন, নৃত্যজগৎ এরকম ব্যানারগুলোতে আমরা **মহুয়া** পালা করেছি আগে। [২৭]

'উদীচী সংগঠনে পুরুষ শিল্পীদের তুলনায় নারীশিল্পী অনেক বেশি। সারোয়ার কামাল রবীন বলেন, 'আমরা ছেলে শিল্পীদের সংকটে ভুগছি।' [২৮]সুতরাং উদীচীর ক্ষেত্রে শিল্পচর্চায় নারীদের অগ্রগতি বেশি দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীটাকে নিজের মতো করে দেখা, স্বাধীনতা, উন্নত ভাবনা, প্রগতির প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে মেয়েরা শিল্পচর্চার অগ্রগতির দিকে এগিয়ে আসছে। উদীচী সংগঠনের নারী শিল্পীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারই প্রমাণ। রবিন বলেন,

> অনেক জায়গায় দেখেছি পুরুষদেরকে নারীরূপে সজ্জিত করে অনুষ্ঠান করানো হয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের অনেক নাটকে মেয়েদেরকে পুরুষ বানিয়ে অভিনয় করিয়েছি কারণ আমাদের এখানে নারীর তুলনায় পুরুষ অভিনেতার সংখ্যা অনেক কম।[২৯]

যেমন, মহুয়া চরিত্রের অভিনেত্রী নিজেই কয়েকবার হুমরা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পুরুষ শিল্পীর সংকটের ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বর্তমান বিনোদনের মাধ্যম পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে, বহুরূপী নাট্য সংস্থার পুরুষ শিল্পীর সংখ্যা কম কেনো জানতে চাইলে শাহদাত খান হিলু বলেন, 'আমাদের দলে পিতৃতন্ত্রের প্রভাব নেই কিন্তু এটি আমাদের সমাজের পরিবারগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। ফলে নারীরা সব দিক থেকে এখনো স্বাধীনতা পাচ্ছে না।'[৩০] এক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় বাধা-নিষেধকে বড় করে দেখেছেন। যার ফলে নারীরা শিল্পচর্চায় এখনো বৃহদাংশ হয়ে উঠতে পারছে না। শাহাদাৎ হোসেন খান হিলু সমাজের নানাবিধ ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু, ময়মনসিংহ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (মাফা) এ নারী শিল্পীর সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। সেখানে ৬০ জন শিল্পীর মধ্যে ৪০ জনই নারী। একটি নাচের দলে এতো নারী শিল্পীর অংশগ্রহণ ধর্মীয় বাধা-নিষেধের বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে।

সমাজের শ্রেণিবৈষম্য উদঘাটনের মাধ্যমে শ্রেণিসচেতনতা বৃদ্ধি করা ছিলো উদীচী'র উদ্দেশ্য। শৈল্পিক দায়িত্বের জায়গা থেকে এবং রাজনীতি সচেতন দল হিসেবে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে বিশ্বাস করে উদীচী। সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই কাহিনির শ্রেণি দ্বন্দ্বের বিষয়টা পালাটি নির্বাচনের অন্যতম কারণ। (রবীন, ২০২১) অপর দিকে প্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, বিয়োগান্তক উপস্থাপনায় দর্শকের আগ্রহ এবং নিজস্ব জাতিগত প্রযোজনাকে মঞ্চায়ন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল মাফা এবং বহুরুপীর কাছে।

সমাজে পুরুষের প্রতি নারীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার সুযোগ নেই বলেই তাদের মত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী অর্থ আয়ের উৎস হতে পারে কিন্তু কোনো বেদে দলের নেতা অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান যাই বলুক, সামাজিক চর্চায় এর বিপরীত দিকটাই দৃষ্টিগোচর হয়।

> বাংলাদেশের সংবিধানের ১০ নম্বর ধারায় জনজীবনে নারীর অধিকার স্বীকৃত। ২৭ ও ২৮ ধারায় বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ ভেদে কোনো রকম বৈষম্য দেখানো যাবে না। ২৮ ধারার ক অনুচ্ছেদে সমাজের পশ্চাৎপদ অংশকে অগ্রবর্তী অংশের সমপর্যায়ে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে এই সমঅধিকারের স্বীকৃতি সত্ত্বেও পারিবারিক আইন তথা বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার স্বত্বের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য রয়েছে। নারীকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। নারী কিন্তু সন্তানের অভিভাবকত্ব কখনো পায় না, ৭ বছর পর্যন্ত দেখাশোনা করতে পারে মাত্র। এখানে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, নারীকে সন্তানের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হল অথচ অভিভাবকত্ব দেওয়া হল না।[৩১]

বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষের বৈষম্য দেখানো যাবে না বলে স্বীকার করলেও স্বয়ং সংবিধানের বিধিতে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

> বাংলাদেশের যে নাগরিকত্ব আইন তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের কোনো পুরুষ নাগরিক বিদেশী নারীকে বিয়ে করলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে যাবেন কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নারী নাগরিক বিদেশী পুরুষকে বিয়ে করলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারবেন না। আসলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র নাগরিক নারীকে ব্যক্তি হিসেবে কখনো মর্যাদা দেয়নি।[৩২]

অর্থাৎ দেশের কাঠামো সুনিশ্চিত করছে নারীদের অবস্থান। যতই মৌখিকভাবে নারী অধিকারের কথা বলে থাকি কিংবা লিখিতভাবে নারীকে সমান অধিকার বা বৈষম্যের স্বীকার না হবার কথা উল্লেখ করি না কেনো নাগরিকত্ব আইনে কিন্তু ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হচ্ছে। নারী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সে দৈহিক ভাবে যতটা কার্যকর অধিকারে ঠিক তার উল্টো।
নারীর শরীর পুরুষতন্ত্রের কাছে লোভনীয় হবার পাশাপাশি নারীর হীনমন্যতা কারন হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

কেইট মিলেট নারী পুরুষের এই আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ককে যৌন সম্পর্কের সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করেছেন। ‘যৌনবাদী আধিপত্য হলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা আদর্শ যা ক্ষমতার মৌলিক ধারণা জোগায়। যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের সকল পথ পুরুষের কাছে। মিলেট ভাবাদর্শগতভাবে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে আদর্শগত ক্ষেত্রে সম্মতি আদায়ের মধ্যদিয়ে নারী ও পুরুষকে সামাজিকীকরণ করে।’[৩৩]

মা, মেয়ে, শাশুড়ি, ননদ কিংবা জা প্রতিটি নারী চরিত্রের পৃথক বৈশিষ্ট আরোপ করে সমাজ নারীর আচরণকে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

> রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী যে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না তার জন্য সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাই দায়ী। একদিকে জাতীয় সংসদ বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নারীর 'সংরক্ষিত' প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অন্যদিকে পারিবারিক শৃংখলে বন্দি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে নারীকে ভালো স্ত্রী ও ভালো মা হতে হবে। সংসারের ভালো-মন্দ দেখতে হবে যার কোনো বিনিময় মূল্য নেই। পরিবারের এই বৃত্ত ভেঙে ক'জন নারীর পক্ষে বাইরের জগতে কাজ করা সম্ভব? বিষয়টি অনেকটা কারো পায়ে শিকল দিয়ে উড়তে বলার মতন।[৩৪]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নারীকে যোগ্য হয়ে ওঠার নিমিত্তে কঠোর প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারীকে সীতার ন্যায় পরীক্ষা দিতে হয় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যদিও এই পরীক্ষার ফলাফল থাকে পূর্বনির্ধারিত।

> ১৯৭৫ সালের মেক্সিকো সম্মেলনে এসথার বোসেরাপের 'Women's Role in Economic Development' নামের গবেষণা গ্রন্থটি বিশ্ব বিবেকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল এ কারণে যে, গ্রন্থটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকার এমন এক চিত্র তুলে ধরেছিল, যা কখোনই নীতিনির্ধারকদের কাছে ধরা পড়েনি। গবেষক লেখিকা পরিষ্কার ভাষা-বাক্য, তত্ত্ব-উপাত্ত উপস্থাপন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, নারী কর্ম করেই জীবন ধারণ করে, পরের উপরে ভর করে নয়। কিন্তু এ ধরণের কর্মকে 'কর্ম' বলে স্বীকার না করার কারণে এ ধরণের কর্মে নিয়োজিত নারীকে কর্মজীবী বলেও স্বীকার করা হয় না।[৩৫]

প্রাত্যহিক সকল কর্মকাণ্ড নারীর কর্তব্য বলেই বিবেচিত। সমাজ নারীর এই দৈনন্দিন কর্মকে বাধ্যানুগত থাকার মৌলিক শর্ত বলেই মনে করে। পরিবারের প্রাত্যহিক কার্যক্রমে নিয়োজিত নারী বিশেষ সম্মান লাভ করে না, এমনকি কর্মজীবী নারীর প্রতি সমাজে বৈরি মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীকে 'অবলা' নারীর তকমা প্রদান করার হলেও সমাজের অধিকাংশ কর্মজীবী নারীও নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশে প্রায়শই নীরব থেকে যায়। মহুয়ার ক্ষেত্রেও এই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

উদীচীর নারী চরিত্রের অভিনেত্রী ফাহমিদা ইয়াসমিন রুনা যে কথাটা বলতে চেয়েছিলেন,

> আমরা আমাদের সময়ে যতটা ভেবেছি এই সময় আমার মেয়ে তার থেকেও আধুনিক ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। আমার মেয়ে আমার থেকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবতে পারছে। কিন্তু যখন দেখছি যে মেয়ে আমাকে ছাড়িয়ে ভাবছে এবং সে তার সময় অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছে তখন আমি নিজের মেয়েকে বাধা দিচ্ছি। কী করতে হবে এবং কীভাবে করবে তা বলে দিচ্ছি। মেয়ের ভাবনা আমাদের সমাজের প্রেক্ষিতে ঠিক নয় বলে নিজের মেয়ের ভাবনাকে আমি মোডিফাই করার চেষ্টা করছি।[৩৬]

ফাহমিদা ইয়াসমিনের আলোচনার প্রেক্ষিতে সমাজে পুরুষতন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে নারীকেই নারীর বিপরীতে ব্যবহার হতে দেখা যায়। 'আধিপত্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারের ভূমিকা অন্যতম, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে বৈধ নাগরিকত্ব দেওয়া হলেও নিয়ন্ত্রণ করা হয় পরিবারের মধ্যে দিয়ে'।[৩৭]

পরিবারের নারী সদস্যসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীরাই পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাকাঠামোকে বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, আচরণ সকল দিকেই সপরিবারের নারী অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই নারীরা নিজেদের ক্ষমতা পরিসর তৈরি করে অক্ষুণ্ন রাখতে চায়।

মাফার পালং সই চরিত্রের অভিনেত্রী তোয়া প্রশ্নের জবাবে উত্তর দেবার সময় তার সামনে তার বাবা, দলের সভাপতিসহ অন্যান্য পুরুষ অভিনেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনে তার কথা বলার ভঙ্গিমা ও আওয়াজ থেকে তার আভ্যন্তরীণ সংকোচ স্পষ্টই ধরা পড়ছিল। সে তার নিজের কথাগুলো বোঝাতে পারছে না বা তার কথার পক্ষ নিয়ে সে আত্মবিশ্বাসী নয়। কথার মাঝখানে হঠাৎ তার বাবা তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এসে কথা বলতে শুরু করেন। কারণ, তিনি এখনো বয়সে ছোট। মাত্র দশম শ্রেণিতে পড়ে। সুতরাং তোয়ার কথা টেনে নিয়ে পুরুষ সদস্যরা বারবার কথা বলছিল। তার কথা বলার প্রবণতাকে তার বাবাসহ অন্যান্যরা বাধাগ্রস্থ করছিল, কিন্তু শেষের দিকে মহুয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে এসে তোয়া বলছে 'মহুয়ার মত সবাই স্বাধীন হতে চায়।'[৩৮] অর্থাৎ সে তার অবচেতনে এখনও পর্যন্ত পরাধীন রয়ে গেছে। আমাদের সমাজ নারীদের জন্য এখনও পুরোটা সাবলীল হয়ে ওঠে নি। এই সময়ে এসেও মহুয়া নিয়ে কাজ করে, বিশ্লেষণ করে মহুয়ার সীমাবদ্ধতাগুলো জানার পরও তোয়া অনুভব করছে আমাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন, স্বাধীন হওয়া প্রয়োজন। নাট্যপ্রযোজনার অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জীবনে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব রাখছে কি? এখনো আমরা স্বাধীনতা কামনা করছি। নারীরা এখনো মহুয়ার মত মুক্তিলাভ করতে চাইছে। মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হচ্ছে। নিজের পছন্দ মত কাজ করছে। নিজের পছন্দ মত জীবনসঙ্গী বেছে নিচ্ছে। তারপরও তারা ভেতরে এখনো পরাধীনতা বোধ করে। পরাধীনতার কারণ হলো এখনো নারীদের আভ্যন্তরীণ আত্মবিশ্বাসের দূর্বলতা। পুরুষের কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দৃঢ় কণ্ঠে দিকনির্দেশনা দেওয়ার সামর্থ্য নারীদের দমিয়ে রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হীনমন্যতার ফলে নারীরা পুরুষদের ছাপিয়ে যেতে পারে না বলে তাদেরকেই কর্তা বলে মনে করে।

উক্ত বিশ্লেষণে অতীতের নারী এবং বর্তমান নারী সম্বন্ধে বিশেষ ধারণালাভ করা যায়। বর্তমানের নারী দৃশ্যত অনেক বেশি স্বাধীন, কর্মক্ষম, ভাবপ্রকাশে পটু বলে মনে হলেও আদতে তা অন্তঃসারশূন্য। এখনো সমাজকাঠামোয় নারী সর্বক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ।

নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এমনটা ভাবাটাও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির নামান্তর। নারীমুক্তির সাথে একাত্ব হতে অনেক পুরুষকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়। মূলত নারী-পুরুষ ধারণার বাইরে মানবতাকে সামনে নিয়ে আসলে এই সংকট অনেকটাই প্রশমিত হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনেও অনেক পুরুষ নারীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে এগিয়ে চলেছে, ঠিক তেমনি শিল্পেও অনেক পুরুষ নারীর বয়ান উপস্থাপনে পিছপা হয় না।

'মহুয়া' নাট্য পালাটি পুরুষ নাট্যকার রচিত। পুরুষ নির্দেশকের নির্দেশনায় মঞ্চায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই নাট্যদলসমূহ পুরুষ আধিপত্যে পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এটি অবশ্যই বোধগম্য যে, এমতাবস্থায় নারীর প্রতিরূপায়ণ কীভাবে কার্যকর হচ্ছে। আবার, এ কথাও গুরুত্বপূর্ণ, সকল পুরুষই কি নারীর জন্য কিংবা নারী সম্বন্ধে নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টির জন্য দায়ী! না কি নারী নিজেও কখনও কখনও এর জন্য দায়ী?
এ প্রসঙ্গে জুরিথ বাটলার বলেন,

> জেন্ডারপূর্ব নির্ধারিত নয়। জেন্ডার এমন এক নমনীয় পরিচয় যা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে পরিচালিত হয়। অভিকরণশীলতা হল ভাষাগত এবং অবাচনিক সফল প্রকাশক্ষম ক্রিয়ার প্রকাশ যা পরিচয় ও স্বরূপতা নির্মাণ করে। অভিকরণশীলতা পরিচয় নির্মাণ করে একই সাথে ঐ পরিচয়ের আশে- পাশে ঘিরে থাকা বাস্তবতাকে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করে। জৈবিকভাবে নির্মিত নারী- পুরুষের ধারণা হলো পুনঃধারণা, যৌনতার ধারণাটা সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত।[৩৯]

সুতরাং জৈবিকতা কিংবা যৌনতার ধারণা নারী- পুরুষ চিন্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরির প্রধান শর্ত নয়। পুরুষ নাট্যকার, নির্দেশক কিংবা দলপ্রধান হলেই তার প্রভাব নারীর অবস্থা প্রকাশে নেতিবাচকতা প্রকাশ করবে তা নাও হতে পারে। আবার নেতিবাচকতার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাও যায় না। এই পালাটির উপস্থাপনায় তাই প্রতিরূপায়ণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

নাট্যে যেখানে অভিনেতা পক্ষে দাঁড়ায় (Stand for) বা ছদ্মবেশ ধারণ করে গল্পের চরিত্রের হয়ে আর সেই ‘পক্ষে দাঁড়ানো’ কোন ‘পক্ষে কথা বলে’ (Act for) তার ব্যাখ্যা ‘মহুয়া' সম্বন্ধে নবধারণা লাভে সহায়তা করেছে। উদ্দেশ্য এক হলেও প্রকাশভঙ্গীর কারণে নির্মিত অর্থ ভিন্ন হতে পারে। নারীর নামকরণে পরিবেশিত প্রযোজনা নারীর অসহায়ত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়ে উঠতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর আপাত আধুনিক নারী এখনো মহুয়ার মতো খুঁজে পেতে চাইতে পারে তার স্বাধীনতা। অর্থাৎ দৃশ্যত সমাজের পরিবর্তন কতটা অন্তঃসারশূন্য তা উপলব্ধি করে এই গবেষণা সমাজকে নারী মুক্তির কুহক জাল সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারে। তবে একথাও স্বীকার্য এই সংকট শুধু নারীর জন্যেই প্রযোজ্য তা নয়, কিছু ক্ষেত্রে পুরুষও এ সকল সংকট এড়াতে অক্ষম। সুতরাং নারী কিংবা পুরুষের দৃষ্টিতে নয় মানুষ হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। বর্তমানে অনেক নারীবাদী আন্দোলনকর্মী নিজেদের নারী আন্দোলনের সাথে নয় মানবতাবাদী আন্দোলনের কথা বলছে।

> সে সময়ে নারীর উপর যে দমন ছিলো তা এখনো বিদ্যমান আছে। একইভাবে না থাকলেও তা ভিন্ন ভাবে এখনও হয়ে আসছে।...দেখুন, দর্শক একটা কাহিনীর উপস্থাপন দেখতে চায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখতে চায় না। দর্শক হাসতে চায় নয়তো কাঁদতে চায়। সংলাপে সুসজ্জিত সুগঠিত কাহিনি শুনতে চাই। সুতরাং আমরা বিশ্লেষণাত্মক জায়গায়

> না গিয়ে গীতিকারের কোনো পরিবর্তন করি নি। একটি চরিত্রকে আমরা নানাভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাই ভাঙতে চাই কিন্তু পাশাপাশি আমাদের ভাবতে হয় যে দর্শক কী চায় বা তারা কিভাবে নেবে। এত ভাবার সময় তো তাদের নেই। সুতরাং সেই ভাবনা মাথায় রেখে আমাদের নাটক করতে হয়।[৪০]

সারোয়ার জাহান নাট্যের শেষাংশে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজের পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছেন কিন্তু পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সাংগঠনিকভাবে কোনো ভূমিকা রাখছেন না। *মহুয়া* যে সংস্কৃতির সীমায় আবদ্ধ তারাও সেই একই সমাজের আবহে *মহুয়া*র প্রতিরূপায়ণ করছেন অর্থ্যাৎ *মহুয়া*'র সাথে তাদের চিন্তার কোন পার্থক্য তৈরী হচ্ছে না। মহুয়ার মত তারাও নিজেদের পারিপার্শ্বিকতাকে নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিচ্ছে। ফলে, খুব সাবলীলভাবে শিল্পের দায়িত্ব বর্তমান শিল্পীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। অপারগতার দায় নিজের ভাগ্যের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

> এখন যেটাকে আমরা '*মহুয়া* পালা' বলি এটা শুরুর দিকে কিন্তু এই নামে ছিল না। নাম ছিল 'মেওয়া চান্দের পালা' পরবর্তীতে এই নামকরণের পরেই এই কাহিনীটাই 'নইদ্যার চান্দের পালা' নামে, কোন কোন অঞ্চলে আবার 'হুমরা বাইদার পালা', আবার কোথাও 'ওনরা বাইদার পালা' নামেও পরিবেশিত হয়েছে।[৪১]

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা সমাজের কোনো বিষয়ে মৌখিক স্বীকৃতি লাভ করলেই সেই সমাজ উক্ত ধারণাকে চর্চা করে বলে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। দেখতে হবে তাদের কার্যক্রম। ধর্মের প্রতি ভক্তি এই অঞ্চলের মানুষের ঐতিহ্যগত চর্চা, বিশেষ করে এ অঞ্চলের আদি ধর্ম সনাতন হওয়ায় দেবীদের প্রতি বিশেষ ভক্তিমূলক উপস্থাপনায় এই অঞ্চলের মানুষকে এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। দেবী ভক্তি এ অঞ্চলের মূলে থাকলেও নারীর প্রতি ধারণা কী অবস্থায় রয়েছে তা কিন্তু এই সাহিত্যকর্মগুলো বিশ্লেষণ করলে ধারণা লাভ করা যায়। দেবী চিন্তা যতটা উপস্থাপনাকেন্দ্রিক সামাজিক চর্চায় ততটা দেবী কিংবা তার সামাজিক প্রতিফলন 'নারী'কেন্দ্রিক নয়। নারী এখানে প্রেয়সী, প্রেমিকা, মাতা কিংবা আরাধনার বিপরীতে সহিংসতার ক্ষেত্র হিসেবে নিপীড়িত হতে দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিতেও মহুয়ার প্রতি প্রেম ও মোহনীয় আচরণে ধাবিত করে যতটা তার চেয়ে কামনার, অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার এবং ক্ষমতা কাঠামোকে অমান্য করায় প্রতিহিংসার বস্তু হতে দেখা যায়।

নাট্যের ভেতরে নারীর অবস্থান এবং এই সময়ে নারী হিসেবে নারীর অবস্থান বিপরীতমুখি নয়। সময়ের পরিক্রমায় সবকিছুই পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতার সেই প্রাচীন রূপ নতুনরূপে একবিংশ শতকেও বিদ্যমান। নারীকে অবদমনের প্রচেষ্টা এখনো সমাজ দর্শনে প্রোথিত আছে। মহুয়া তার সময়ে দাঁড়িয়ে কোনো মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু বর্তমান সমাজে নারী কথা বলেও নিজের অবস্থার কার্যকর পরিবর্তন আনতে পারছে না। আমরা সমালোচনা করছি, আন্দোলন হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, লেখালেখি হচ্ছে কিন্তু তারপরও সমাজের অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ নারী তার খোলস বদলালেও তার কাঙ্খিত অবস্থায় এখনো পৌঁছাতে পারে নি, কারণ নারী এখনো সমাজের রুচি অনুযায়ী নিজেকে সাজাতে পছন্দ করে, নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও

ভূমিকা রাখতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। নারীর কাছে পুরুষের প্রত্যাশার ধারাবাহিকতায় কোন বাঁধা পড়ছে না। ফলে নারীর প্রতি পুরুষের চিন্তার বাহ্যিক পরিবর্তনকে প্রায়োগিক রূপ দেয়া সহজ নয়।

মহুয়া উপস্থাপনে তিনটি দলের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সমাজ দর্শনের বহিঃপ্রকাশ। কোথাও পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের বিপরীতে পাণ্ডুলিপির ব্যাখ্যামূলক পরিবর্তন সাধন করে উপস্থাপন হতে দেখা গিয়েছে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে নারী উপস্থাপনার খোলসে পুরুষতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশে পালাটির নাম পরিবর্তন করেও মঞ্চায়িত হবার সংবাদ পাওয়া গেছে। পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের পর পরিবেশনা বিশ্লেষণ কালক্রমে পর্যায়ক্রমিক রূপরেখা অংকনে সহায়তা করেছে। পাণ্ডুলিপি রচনাকালের নারী এবং বর্তমান উপস্থাপনাকালের নারী ধারণার মূল পার্থক্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হলেও অন্তর্গত হীনমন্যতা অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়েছে। সমাজের অর্থনৈতিক বা জীবন যাপনের মানের পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি নারী সম্বন্ধীয় দর্শনগত পরিবর্তন জরুরী। ক্ষেত্র বিশেষে নারী ভাবনার উন্নয়ন সাধন হলেও আরও হাঁটতে হবে অনেক পথ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। Judith Butler, 'Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory'. Vol. 40, No. 4 (Dec., 1988), p. 519-531
Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/3207893, Visited on, 06.06.2014
২। Gayatri Chakraborty Spivak, 'Can The Subltern speak', Histoty Workshop journal, Oxford University Press, vol.58 (2004), p. 3-59.
৩। William John Thomas Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation (U.S.A: University of Chicago Press, 1994), p.11-34.
৪। দ্বিজ কানাই, '(দৃশ্যকাব্য) দ্বিজ কানাই প্রণীত (প্রাচীন পল্লীনাটিকা)', মাহবুবুল আলম সম্পা., *ময়মনসিংহ গীতিকা*। (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৯) পৃ. ৪২
৫। সিমোন দ্য বোভোয়ার, 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', হুমায়ুন আজাদ অনু.(ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ১৮৩।
৬। দ্বিজ কানাই, '(দৃশ্যকাব্য) দ্বিজ কানাই প্রণীত (প্রাচীন পল্লীনাটিকা)', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
৭। ফাহমিদা ইয়াসমিন রুনা খান, অভিনেত্রী, 'মহুয়া পালা', বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩০ অক্টোবর ২০২১, ময়মনসিংহ।
৮। দ্বিজ কানাই, '(দৃশ্যকাব্য) দ্বিজ কানাই প্রণীত (প্রাচীন পল্লীনাটিকা)', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৯। তদেব, পৃ. ৪৫।
১০। তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪।
১১। শাহাদাত হোসেন হিলু, পরিকল্পনা, 'মহুয়া পালা', বহুরূপী নাট্যসংস্থা, গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩০ অক্টোবর, ২০২১, ময়মনসিংহ।
১২। দ্বিজ কানাই, '(দৃশ্যকাব্য) দ্বিজ কানাই প্রণীত (প্রাচীন পল্লীনাটিকা)', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
১৩। তদেব, পৃ. ৫৭
১৪। তদেব, পৃ. ৫৮
১৫। তদেব।
১৬। Gerald Turkel, 'Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge' Journal of Law and Society, Vol. 17, No. 2 (U.K, Cardiff University, 1990), p.170-193 Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/1410084, Visied on, 13.10.2019
১৭। দ্বিজ কানাই, '(দৃশ্যকাব্য) দ্বিজ কানাই প্রণীত (প্রাচীন পল্লীনাটিকা)', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
১৮। তদেব, পৃ. ৬৬
১৯। Gayatri Chakraborty Spivak, 'Can The Subltern speak', Histoty Workshop journal, Oxford University Press, vol.58 (2004), p. 3-59.
২০। নশিন আনবার তোয়া, অভিনেত্রী, 'মহুয়া পালা', ময়মনসিংহ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার, অক্টোবর ৩০, ২০২১, ময়মনসিংহ।
২১। নাজমুল হক লেলিন, অভিনেতা, 'মহুয়া পালা', ময়মনসিংহ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩০ অক্টোবর, ২০২১, ময়মনসিংহ।
২২। শাহাদাত হোসেন খান হিলু, পরিকল্পনা, 'মহুয়া পালা', প্রাগুক্ত, ৩০ অক্টোবর, ২০২১।
২৩। দ্বিজ কানাই, '(দৃশ্যকাব্য) দ্বিজ কানাই প্রণীত (প্রাচীন পল্লীনাটিকা)', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

২৪। সারোয়ার জাহান, অভিনেতা, 'মহুয়া পালা', ময়মনসিংহ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩০ অক্টোবর, ২০২১, ময়মনসিংহ।
২৫। তদেব, ৩০ অক্টোবর, ২০২১
২৬। তদেব।
২৭। তদেব।
২৮। সারোয়ার কামাল রবীন, অভিনেতা, 'মহুয়া পালা', বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ৩০ অক্টোবর, ২০২১, ময়মনসিংহ।
২৯। তদেব, অক্টোবর ৩০, ২০২১
৩০। শাহাদাত হোসেন খান হিলু, পরিকল্পনা, 'মহুয়া পালা', বহুরূপী নাট্যসংস্থা, প্রাগুক্ত, ৩০ অক্টোবর, ২০২১।
৩১। সুলতানা কামাল, 'নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি'(ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৮ .
৩২। তদেব, পৃ. ১৯
৩৩। Kate Millet, 'Sexual Politics', Australian Institute of Policy and Science, Vol. 43, bo. 4 (Dec., 1971), p.121-125.
৩৪। সুলতানা কামাল, 'নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি', প্রাগুক্ত, পৃ.২০।
৩৫। তদেব, পৃ. ১২২।
৩৬। ফাহমিদা ইয়াসমিন রুনা, অভিনেত্রী, 'মহুয়া পালা', প্রাগুক্ত, ৩০ অক্টোবর, ২০২১।
৩৭। Kate Millet, 'Sexual Politics', ibid, p.121-125.
৩৮। নশিন আনবার তোয়া, অভিনেত্রী, 'মহুয়া পালা', প্রাগুক্ত, অক্টোবর ৩০, ২০২১।
৩৯। Judith Butler, 'Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory', ibid, p. 519-531
৪০। শাহাদাত হোসেন খান হিলু, পরিকল্পনা, 'মহুয়া পালা', প্রাগুক্ত, ৩০ অক্টোবর, ২০২১।
৪১। সারোয়ার জাহান, অভিনেতা, 'মহুয়া পালা', প্রাগুক্ত, ৩০ অক্টোবর, ২০২১।